প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভের পাঁচ হাজার শব্দের সারাৎসার

অভিসন্দর্ভের বিষয়

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস : কথনতত্ত্বভিত্তিক বীক্ষা

গবেষক

সেখ সাব্বির হোসেন

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর R-19RS102160216 dated 25th February, 2021

এনরোলমেন্ট নম্বর PU/PHD/BENG/2019/030 dated 1st July, 2019

গবেষণা নির্দেশক

ড. সন্দীপকুমার মণ্ডল

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

PRESIDENCY UNIVERSITY
KOLKATA

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

৮৬/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩

২০২২

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস : কথনতত্ত্বভিত্তিক বীক্ষা

(গবেষণাপত্রের পাঁচ হাজার শব্দের সারাৎসার)

প্রস্তাবনা

বাংলা উপন্যাসের ধারায় সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) এক স্বতন্ত্র ঘরানার শিল্পী। এই স্বতন্ত্রতা তাঁর উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক কৌশলে ধরা পড়ে। আবার সতীনাথের উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে গবেষণা তাঁর উপন্যাসের শিল্পভাবনায় প্রায় অনালোচিত থেকে গেছে। বিশেষ করে সতীনাথের উপন্যাসের সামগ্রিক কথনরীতি বিষয়ক আলোচনা তেমন নেই বললেও চলে। উপন্যাসের এই 'কথনরীতি'ই সতীনাথের উপন্যাসের কীর্তিপতাকা বলা চলে। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে সতীনাথের উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বাংলা উপন্যাসের 'কথনরীতি' প্রথাগত ধারণা অনুযায়ী নয়। বিশশতকের সাহিত্যবীক্ষাতত্ত্বের অন্যতম শাখা কথনতত্ত্বের (Narratology) নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আমাদের দেশে মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা ও উদ্বাস্তু সমস্যা—এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘনিয়ে তুলেছিল গভীর সংকট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগবিকারগুলি আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল এসময়ে। ফলে জনজীবনের জটিলতা, মানবমনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব, নানাবিধ সামাজিক সমস্যার কথা লেখকদের ভাবতে হচ্ছিল। এতদিন ধরে বাংলা উপন্যাসে ব্যবহৃত হতে থাকা Content ও Form এর পরিবর্তন দেখা দিল। উপন্যাসে (কথাসাহিত্যে) মনোলোকের রহস্য উন্মোচনে জটিল জীবন-নিরীক্ষার অভিনব শিল্পের বুনোট অনিবার্য হয়ে উঠল। সতীনাথ ভাদুড়ী এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক। পাশ্চ্যাত্যের কথাসাহিত্যে যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভার্জিনিয়া উল্ফ (১৮৮২-১৯৪১), জেমস্ জয়েস (১৮৮২-১৯৪১), মার্শেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২) প্রমুখ শিল্পীরা শুরু করেছিলেন, বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) এর একক প্রয়াসের পরে এই ধারায় তেমন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেনি। সতীনাথই সেক্ষেত্রে যথার্থ উত্তরসূরি। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> 'সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসগুলির কথা একসঙ্গে মনে করলে চমৎকৃত হতে হয় তাদের বিষয়-ভাবনা ও প্রকরণের

> অনন্যতায়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালি লেখক সতীনাথের মতো এমন করে টেকনিক ও বিষয়ের অভেদ ধ্যান করেননি।'[১]

সতীনাথের প্রতিভার প্রস্তুতি, বিকাশ ও পরিণতি সাধিত হয়েছে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্রোত-প্রতিস্রোতের দ্বান্দ্বিক সংঘাতে। চেতনাপ্রবাহের আধুনিক রীতিতেই মানব-মনের আশ্চর্য গতিকে তিনি ধরবার চেষ্টা করলেন। বলা যায়, এই রীতি ব্যবহারে বাংলা উপন্যাসে এক পালাবদল ঘটল। রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসে এই রীতির প্রয়োগ ঘটালেও তাঁর জীবৎকালের অবশিষ্ট ২৫ বছরে আর কোথাও এই রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি। এই ধারায় 'কথনরীতি'র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সতীনাথ তাঁর নিজস্ব শিল্পজগৎ গড়ে তুললেন। বিশিষ্ট শিল্পী খুঁজে নেন কিংবা নির্মাণ করেন তাঁর নিজস্ব 'বাচন'। এটা সংগতভাবেই শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সতীনাথের উপন্যাসের কথনরীতির এই অভিনবত্বই আমাদের গবেষণার বিষয়।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কথনতত্ত্ব (Narratology) সাহিত্যবীক্ষার একটি শাখা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'কথা' হলো সময়ের প্রেক্ষিতে বাস্তব বা কাল্পনিক কোনো ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রতিরূপ। কথায় প্রতিস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আরো গুরুত্বপূর্ণ সময়গত ক্রমের প্রসঙ্গটি। কথার আবশ্যিক উপাদানগুলি হল: কথন, বর্ণন, বিবৃতি বা ভাষ্য, বাচন। সমস্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রক হল কথন। কথন এক বা একাধিক ঘটনা ও পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করে গড়ে তোলে একটি সন্দর্ভ। স্বাভাবিকভাবেই বর্ণন ও বিবরণ থেকে যার পৃথক পরিচিতি গড়ে ওঠে। এভাবেই উপন্যাসেরও কথন নির্মিত হয়। একটি কথার ক্রিয়াপদ্ধতিগত প্রকৃতি (Theory) এবং প্রণালীবদ্ধ (Systematic) পাঠ নিতে সাহায্য করে এই 'কথনতত্ত্ব'। যা কোনো কথার প্রকৃতি, রূপ, ভূমিকা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে। যে বিশ্লেষণ উপস্থাপনার মাধ্যমকে গ্রাহ্য করে না। 'কথনতত্ত্ব' কথার উপযুক্ততার (Narrative Competence) চরিত্রায়ণের চেষ্টা করে। একটি কথার অন্তর্গত গল্পভাগ (Story), কথনক্রিয়া (Narrating) এবং তাদের সম্পর্কগুলোকে পরীক্ষা করে দেখে---কোথায় একটির থেকে অন্যটির পার্থক্য তৈরি করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, কথনতত্ত্ব চেষ্টা করে সেগুলিকে তুলে ধরতে ও বুঝতে এবং সেগুলির সামর্থ্য কতটা গ্রাহ্য তাও বিচার করে। গেরাল্ড প্রিন্স (Gerald Prince) বলেন,

> 'It is therefore not so much concerned with the history of particular novels or tales, or with their meaning, or with their aesthetic value, but rather with the traits which distinguish narrative from other signifying systems and with the modalities of these traits.'[২]

সতীনাথ ভাদুড়ী যখন উপন্যাস রচনা (১৯৪৫) করছেন তখন 'কথনতত্ত্ব' নামক সাহিত্যবীক্ষাতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেনি। কথাসাহিত্যে সব দেশেই কথনতত্ত্বের আলোচনা কথাশিল্পের সৃষ্টির দীর্ঘদিন বাদে শুরু হয়েছে। অতএব আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি তা আগে থেকেই লেখন প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল। ফলে সতীনাথ যখন লিখছেন তাঁর লেখার ধরণ তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যুক্ত আছে বলা যায়। জীবনকে কীভাবে তিনি দেখেছেন সেই নিবিড়তার প্রমাণ আছে তাঁর রচনায়। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক পবিত্র সরকারের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> 'তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার আগেই যেহেতু বহুসংখ্যক মহৎ উপন্যাস পৃথিবীতে লেখা হয়ে গিয়েছে সেহেতু এ তত্ত্ব উপন্যাস লেখকদের কাছে নতুন কোনো দীক্ষা বা দিগ্‌দর্শন তুলে ধরেছে, এমন নয়। বড়ো ঔপন্যাসিকরা এ তত্ত্ব প্রকাশ্যে না জানলেও তাঁদের উপন্যাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আগে থেকেই ধরা পড়েছে। এ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা না হলেও মহৎ উপন্যাস লেখা হত।
>
> এ মূলত সমালোচকদের জন্য, উপন্যাসের বহিঃসংগঠন ও অন্তঃসংগঠনকে বোঝবার তত্ত্ব। সৃষ্টির তত্ত্ব নয়, বিচারের তত্ত্ব। সৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা ও মহত্ত্বের সূত্র কোনো সমালোচনাতত্ত্বই সরবরাহ করতে পারে না। আরিস্তোত্‌ল থেকে বাখ্‌তিন---কেউ তা পারেননি।'[৩]

আমাদের গবেষণায় এই কথনতত্ত্বের রীতিকে ভিত্তি করে সতীনাথের উপন্যাসকে দেখতে চেয়েছি। সমগ্র গবেষণা প্রকল্পের পরিকল্পিত অধ্যায় বিন্যাস নিম্নরূপ :

প্র থ ম অ ধ্যা য়

সতীনাথ ভাদুড়ী : সমকালীন সময়, সমাজ ও সাহিত্যতত্ত্ব

বাংলা উপন্যাসের ধারায় সতীনাথ ভাদুড়ী অন্যতম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতোই সতীনাথের চেতনামূলে সমকালীন সমাজ, সমসময়, রাজনীতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ আর সমাজ-সময় সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল সমকালীন সমাজজীবনের পরিবর্তনশীল চালচিত্রকে তুলে ধরতে। রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগে সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে নানাবিধ অভিজ্ঞতা, তাদের সমস্যা-সংকট উপস্থাপনসূত্রে সতীনাথ রচনা করেন এক একটি সামাজিক ভাষ্য। আর এই সামাজিক ভাষ্য রচনায় নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও ভাবনার সঙ্গে একীভূত হয়েছে সমাজ-সাহিত্য দর্শন সম্পর্কে তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়। গভীরতর বাস্তবতাকে সতীনাথ জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন বলেই সমকালীন পাঠকের কাছে নিজের রচনা জনপ্রিয় করে তোলার পরিবর্তে, নির্জন পরিবেশে তিনি সৃজন করে গেছেন অবক্ষয়ী সমাজব্যবস্থার স্বরূপ এবং সমস্যাজর্জর মানবাত্মার বিচিত্র রূপ।

সতীনাথ ছিলেন ইতিহাস ও অর্থনীতির ছাত্র। তাই সমাজব্যবস্থার ছবি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সমাজ সংস্কারমূলক কাজ তিনি প্রায়ই করতেন। ১৯৩৪ সালে গান্ধীজির পূর্ণিয়ায় আগমন সতীনাথের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। গান্ধীজির আদর্শে সাধারণ মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ সেবার ভার গ্রহণে সতীনাথ এ সময় পূর্ণিয়ার টিকাপট্টির আশ্রমে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। এখান থেকেই শুরু হয় সতীনাথের রাজনৈতিক জীবন। সতীনাথের কংগ্রেসে যোগদান পূর্ণিয়ায় বিরাট প্রভাব পড়ে। পূর্ণিয়া শহর থেকে ২০-২৫ মাইল দূরে গ্রামীণ পরিবেশে টিকাপট্টির আশ্রমে স্বেচ্ছা নির্বাসন সতীনাথকে রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত করে তুলেছিল। যুবক সতীনাথ সমাজসেবা, পিকেটিং প্রভৃতিতে অংশ নিতে নিতে পথের সন্ধান করছিলেন। মনের মধ্যে যে জনসংযোগের আকুলতা তৈরি হচ্ছিল বা যে আদর্শবোধ দানা বাঁধছিল সেটার সঙ্গে গান্ধী আদর্শের ঐক্য দেখতে পেয়েছিলেন। ১৯৩১-১৯৩৯ পূর্ণিয়ায় নিজের বাড়িতে থাকবার সময়ই তিনি পশুবলির বিরুদ্ধে জনমত তৈরির জন্য সভা, বক্তৃতা দিয়েছেন। সে সময় গান্ধীজির প্রিয় শিষ্য গোকুলকৃষ্ণ রায়ের নেতৃত্বে পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেস গড়ে উঠেছে। সতীনাথ প্রথমে দ্বিধায় ছিলেন বলে সেভাবে সাড়া দেননি। তবে সর্বোদয় পার্টির নেতা বৈদ্যনাথ চৌধুরি, পুণ্যানন্দ ঝা প্রভৃতিকে নিয়ে গোকুলকৃষ্ণ পূর্ণিয়ায় একের পর এক

যখন সভা-সমিতি করছেন,রাজনৈতিক আন্দোলন করছেন তখনো সতীনাথের মনে রাজনৈতিক সন্ন্যাসী হবার কোনো লক্ষণ দেখা দেয়নি। তাই যেদিন তিনি প্রায় বিনা ঘোষণায় নীরবে ওকালতি ত্যাগ করে, নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে সর্বোদয় নেতার আশ্রমে যোগ দিলেন সেদিন সকলেই বিস্মিত হলেন।

সতীনাথ ছাত্রাবস্থা থেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ভাবিত ছিলেন। তাই পাঠ করতেন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রচনাবলি। পর্যালোচনা করতেন র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পার্টির রাজনৈতিক তত্ত্ব ও কার্যধারা নিয়ে। আবার কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর সমর্থন বা দুর্বলতাও কখনো গোপন করেননি। কিন্তু এই ভাবনাকে তৎকালে বাস্তবায়িত করার কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় নি। কংগ্রেসে যোগদান এক ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগকে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। সমাজসেবামূলক কাজগুলো তাঁর সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি পর্ব ছিল বলা যায়। সতীনাথের এ সিদ্ধান্তকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা সাময়িক হুজুগ বলে মনে করেছিলেন। দাদা ভূতনাথ ভাদুড়ী তাঁকে আশ্রম থেকে ফিরিয়ে আনতেও গিয়েছিলেন, কিন্তু সতীনাথ ফেরেননি। সতীনাথের কংগ্রেসে যোগদান সম্পর্কে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন :

> ‘কাল কে বলল---সতু টিকাপট্টি গিয়েছে। Law practice ছেড়ে দিল। কথাটা বিশ্বাস হয়নি। আজ শুনছি সত্যই সে Congress এর কাজ করবে, তাই গিয়েছে। তারা বরাবর বড় aspiration পোষণ করে, সাধারণে যা করে তাতে মন বসে না। কিন্তু Congress circle এই বা তার মন তুষ্ট থাকবে কি করে? সে হল একটি ক্ষুরধার intellect এর ছেলে, সত্যপ্রিয়, বিদ্যাপ্রিয়, sincere কিন্তু ও circle এ যে প্রায়ই মূর্খ, মিথ্যাভাষীর সঙ্গ জুটবে। মনের মত দোসর বা বন্ধু পাবে না। কারো সঙ্গে বনবে না, কি করে কাটবে। সে নিশ্চয়ই একটা কিছু স্থির করে গিয়েছে। তা হলে একজনও নিজের মত খাঁটি লোক না পেলে, ভালো লাগবে কেন, কাজ হবে কেন? ভগবান তাকে সাহায্য করুন, সে যেন মনের মত এক মতের লোক পায়।’[৪]

কেদারনাথের এ আশঙ্কা প্রাথমিক ভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আসলে সত্যসন্ধিৎসু সতীনাথ গান্ধীভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'তে নিজের সম্পর্কে বলেছেন :

> 'মানুষকে সে ভালোবাসত। তার কাজে উৎসাহের প্রেরণা যোগাতো তার আশাবাদী মন, পরিবেশে স্বাদ জাগাতো নিজের পান্ডিত্যের অভিমানটুকু। তার ভাবপ্রবণ মনে একটা আদর্শবাদির মোহ জন্মেছিল ছোটবেলাতেই। এর প্রাবল্যে সংসারধর্ম করবার কথা তার মনের কোণায় উঁকিঝুঁকি মারবার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি।'[৫]

সতীনাথের সাহিত্য আলোচনার অংশে তাঁর সৃষ্টি সম্ভারের একটি সমগ্র পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বিশ্ব ও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যেসব প্রতিভা তাঁকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছে তার একটি বিস্তৃত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আমরা দেখেছি ফরাসী সাহিত্যের প্রতি তাঁর অসম্ভব এক ধরণের আকর্ষণ ছিল। তিনি ছিলেন মার্শেল প্রুস্তের সাহিত্যের একজন মুগ্ধ পাঠক। লেখক বলেছেন :

> 'Proust এর A la recherehe du Temps perdu পড়বার পর ধারণা জন্মায় যে বইখানি যেন চমৎকারিত্বে পূর্ণ অনেকগুলি মুহূর্তের যোগফল। এই মুহূর্তগুলির ব্যাপ্ত অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে বিস্তৃত করে দেওয়া হয়েছে। লেখকের কৃতিত্ব যেন উচ্ছল মুহূর্তগুলিকে বাছায়, সাজানোতে, তাদের বিস্তৃতি বাড়ানো কমানোতে। এই রকমের লেখায় সাধারণতঃ দৃষ্টি থাকে, যাতে এক পূর্ণমুহূর্ত থেকে আর এক পূর্ণমুহূর্তে যাবার সময় পাঠকের মন যেন ঝাঁকি না খায়। গাঁথুনি আর জোড়ের দাগগুলো যেন হঠাৎ দেখলে বোঝা না যায়। Proust এর কৌশল আলাদা, ঝাঁকানি খাইয়ে খাইয়ে মনকে পুরানো মুহূর্তে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। গাড়ির ঝাঁকানিতে কিছুক্ষণের পর যেমন ঘুম আসে এ বেলায়ও হয় তেমনি। গতির ছন্দ আয়ত্ত হয়ে গেলেই ঝাঁকানি থেকে আরাম পাওয়া যায় দোলনের।'[৬]

এছাড়াও আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি কথনতত্ত্ব নামক সাহিত্যতত্ত্ব শাখার উদ্ভবের পূর্বে আমাদের দেশে ও বিদেশে উপন্যাসের কথন নিয়ে প্রথাগত যেসব আলোচনা পাওয়া যায় তার ইতিবৃত্ত।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

উপন্যাসের কথনতত্ত্ব : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

Narratology শব্দটি ফরাসি Narratologie থেকে এসেছে বলে মনে করেন আখ্যানতাত্ত্বিক তদোরভ (১৯৩৯-২০১৭)। তিনি তাঁর 'Grammaire du Decameron' (1969) প্রবন্ধে Narratologie এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছন। Narratology বা কথনতত্ত্ব বিশ শতকের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। উপন্যাসের আখ্যানকে জানা ও বোঝার জন্য এই তত্ত্বের কোনো বিকল্প নেই। আখ্যানতত্ত্বের আদি পুরুষ হিসেবে এরিস্টটলকে গণ্য করা হলেও, আধুনিক চিন্তায় Morphology of Folktale[৭] (1928) গ্রন্থের লেখক ভ্লাদিমির প্রপ-কে আধুনিক আখ্যানতত্ত্বের পুরোধা বলে স্বীকার করা হয়। প্রপের পদ্ধতিটিকে বলা হয় অবয়ববাদী আখ্যানতত্ত্ব বা স্ট্রাকচারালিস্ট ন্যারেটোলজি। উত্তরকালে আখ্যানতত্ত্ব দারুণ প্রভাব বিস্তার করে পশ্চিমী দুনিয়ায়। রঁলা বার্ত, জাঁক দেরিদা, জাঁক লাকা প্রমুখ ফরাসি চিন্তাবিদেরা এই বিষয় নিয়ে গভীর অধ্যয়ণ করতে শুরু করেন। তাঁদের আখ্যানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অবয়ববাদী ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। এই দশকের আখ্যানচর্চা যে সমস্ত গ্রন্থে ধরা পড়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

১. ওয়েন বুথ, দ্য রেটরিক অব ফিকশন (১৯৬১)
২. জন এল অস্টিন, হাউ টু ডু থিংকস উইথ ওয়ার্ডস (১৯৬২)
৩. আর্থার, সি দানতো, এনালিটিক্যাল ফিলসফি অব হিস্ট্রি (১৯৬৫)
৪. এল টি লেমন এবং আর যে রিজ (সম্পা) রাশিয়ান ফরমালিস্ট ক্রিটিসিজম : ফোর এসেজ (১৯৬৫)
৫. জেরার্ড জেনেট, ফিগারস্ I (১৯৬৬)
৬. গ্রেমাস, সেমানটিক স্ট্রাকচারাল (১৯৬৬)
৭. রবার্ট স্কোলস ও রবার্ট কেলগ, দ্য নেচার অব ন্যারেটিভ (১৯৬৬)
৮. ফ্রাংক কারমোড, দ্য সেন্স অব এণ্ডিং (১৯৬৭)
৯. জেরার্ড জেনেট, ফিগারস্ II (১৯৬৯)

১০. রঁলা বার্ত, এস/জেড (১৯৭০)

১১. জি হার্টম্যান, বিয়ণ্ড ফরম্যালিজম (১৯৭০)

এই সমস্ত গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি এক বিপুল সম্ভাবনার দিশা দেখিয়েছিলেন। যা পরবর্তীকালে কথনতত্ত্ব নামক সাহিত্যতত্ত্ব শাখাটির পথকে প্রশস্ত করে তুলেছিল। এরপর বিখ্যাত সব আখ্যানতাত্ত্বিকদের তত্ত্বকথা সংক্ষিপ্তাকারে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সবশেষে বাংলা উপন্যাসের কথনের বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এইখানে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে কিভাবে স্ট্রীম অফ কনসাস্‌নেস্‌ বিবর্তনের পথে উত্তরকালের উপন্যাসে ম্যাজিক রিয়েলিজম্‌ বা জাদু বাস্তবতায় প্রকাশিত হয়েছে। সময়ের বিবর্তনে নতুন দর্শন এবং চিন্তাভাবনা, শিল্প আন্দোলন কেমন করে বাংলা উপন্যাসের কথন বদলে দিয়েছে সেদিকটি এই অধ্যায়ের উপজীব্য।

তৃ তী য় অ ধ্যা য়

সতীনাথ-পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসের কথনরীতি ও সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের শুরু (১৮৬৫) যেভাবে ঘটল তাতে বেশ কয়েক বছর ধরে চলে আসা বাংলা সাহিত্যের কাহিনী বিবরণের সঙ্গে এই প্রকরণের বিচ্ছেদ ঘটে গেল। এখানে ন্যারেটর বা কথকের অবস্থান, ন্যারেটি বা কথনশ্রোতা, কথন বা কথিতের অবস্থান অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হল। বঙ্কিমের উপন্যাসের মূল দুটি উপাদান হল ইতিহাস ও রোমান্স। ইতিহাসের সত্য ও রোমান্সের কল্পনার মিশেলে উপন্যাসগুলি গড়ে উঠেছে। এইসব ন্যারেটিভের একদিকে থেকেছে ঐতিহাসিক বিবরণ এবং অন্যদিকে কাল্পনিক কাহিনী। ফলে বঙ্কিমের উপন্যাসের কথন গড়ে উঠেছে কখনো ঐতিহাসিক চঞ্চলতায়, যুদ্ধবিগ্রহে, ঘটনার বাহুল্যে বা হৃদয়বৃত্তির তাৎক্ষণিক প্রকাশে। বঙ্কিমের উপন্যাসের কথন মূলত প্লটধর্মিতাকেই অবলম্বন করেছে। তবে বঙ্কিম তাঁর মোট বারো খানি উপন্যাসেই প্লটধর্মিতায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। উপন্যাসের কথন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বঙ্কিম আগ্রহী ছিলেন। তাঁর ‘ইন্দিরা’ (১৮৭৩) বা ‘রজনী’র (১৮৭৭) মতো উপন্যাস সৃষ্টির পেছনে এই পরীক্ষার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাসে বঙ্কিমীরীতির অনুসরণ করেছেন। ফলে এখানকার কথনও বঙ্কিমানুসারী। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন, আধুনিক উপন্যাসের কাজ হল মানুষের

'আঁতের কথা' টেনে বের করে দেখানো। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের অপেক্ষা মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শুরু হল আধুনিক উপন্যাসের যাত্রা। বর্ণনাধর্মিতার বদলে উপন্যাসের কথন হয়ে উঠল বিশ্লেষণধর্মী। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এসে কথনের আবার পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। তাঁর ভাবালুতা সৃষ্টির দক্ষতা ও হৃদয়াবেগ পাঠকমাত্রেই আকৃষ্ট করে। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি একেবারে সাধারণ। সহজ সরল সাবলীলভাবে ঘরোয়া পরিবেশে উপন্যাসের কথন তিনি গড়ে তুলেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে উপন্যাসে পালাবদলের শুরু হল। ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস্ জয়েস প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের রচনায় stream of consciousness নামক নতুন রীতির প্রয়োগ দেখা গেল। বর্হিজগৎ নয়, অন্তর্জগতের নানাবিধ সূক্ষ্ম জটিলতা উপন্যাসে উঠে এল। বাংলা ঔপন্যাসিকরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হলেন। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটল। ন্যারেটিভ টেকনিকও পাল্টে গেল। সতীনাথ সচেতনভাবেই এ শিল্পরীতি গ্রহণ করেছেন। বাংলা ঔপন্যাসিকদের বিশেষ কোন্ ঐতিহ্য তাঁর প্রতিভাকে পুষ্ট করেছে— এই অনুসন্ধান আমাদের গবেষণার উপজীব্য নয়। আলোচ্য অধ্যায়ে সতীনাথ পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসের কথনের গতিপ্রকৃতি বিবেচনায় রবীন্দ্রোত্তর কালের তিনজন শিল্পীকে গ্রহণ করেছি। তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতি প্রেমিক এবং রোমান্টিক। প্রকৃতির অপূর্ব মায়াবী রূপ সৃষ্টিতে তাঁর বিকল্প আর কেউ নেই বাংলা কথাসাহিত্যে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় অঞ্চলের বিষয়কে অসাধারণ বর্ণনা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের বাহন। পুঁজিপতিদের মুখোশ খুলে দিতে এবং মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতার নগ্নরূপ দেখিয়ে দেবার জন্য তিনি মাটির মানুষের কাছে এসেছেন।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যাঁদের হাত ধরে দেশীয় কথনরীতি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপন্যাসের কথনরীতি দেখানোর জন্য আমরা দু'খানি উপন্যাস নির্বাচন করেছি। 'কবি' (১৯৪৪) ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৫১) । তারাশঙ্করের উপন্যাসের একটি প্রধান বিষয় নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্ব। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তারাশঙ্করের মানসিক দ্বন্দ্বটিও স্পষ্ট হয়েছে। তাঁর একটি মন যেমন অপ্রতিরোধ্যভাবে নবীনকালের জয়ীদের কথা বলে তেমনই অন্য একটি মন গভীর সহানুভূতিতে সকরুণ নস্টালজিয়ায় ডুবে যায় পরাজিত

মানুষ, সমাজ ও অর্থব্যবস্থার জন্য। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে সুবাসীকে নিয়ে অরণ্যবানরের মতো হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বনওয়ারী করালীর কাছে হেরে যায়। করালীর মতো নতুনের জয় অবশ্যম্ভাবী একথা জানেন ঔপন্যাসিক, কিন্তু তাঁর সমস্ত পক্ষপাত থেকে যায় ঐতিহ্যের প্রতিভূ বনওয়ারীর প্রতি। যা পুরাতন, যা ঐতিহ্যসম্মত, যা দেশজ তার টানেই তারাশঙ্কর কথকের মতো উপন্যাসে কথা বলেন। পুরাতনের প্রতি পক্ষপাতেই ইংরেজি অথবা ইউরোপীয় আদর্শের কোন তোয়াক্কা না রেখে তিনি কাহিনি বলেন চিরায়ত দেশজ কথনরীতিতে। আখ্যান পদ্ধতিতে। আমাদের লোকসংস্কৃতির 'deepest collective reservoir' থেকে উঠে এসেছে তাঁর আখ্যানপদ্ধতি।

সতীনাথের পূর্বসূরি বিভূতিভূষণের (১৮৯৪-১৯৫০) জন্ম প্রায় একযুগ আগে। নিসর্গমগ্ন এবং অত্যন্ত সহজ সরল স্বভাবের মানুষ। সমাজ ও সময়ের অমঙ্গলের যে বোধ রবীন্দ্রশিল্পে বিশেষতঃ তাঁর পরবর্তী স্তরের কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে বাণীবদ্ধ হয়েছিল, রিলে রেসের মত যতই তার ঘরানা নিয়ে বাঙালী লেখক ক্রমশঃ এগিয়ে থাকুন; তবু স্বরাজ্যে স্বরাট হয়ে আছেন বিভূতিভূষণ, তাঁর সহজ ভাষা, দেশি শব্দ, চেনা পৃথিবীর দিনানুদৈনিক আটপৌরে খঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ ও অম্লান ভালোবাসার প্রদীপ জ্বালিয়ে[৮]। আমরা তাঁর দু'খানি উপন্যাসকে নির্বাচন করেছি কথনশৈলী বিশ্লেষণের জন্য। 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) ও 'আরণ্যক' (১৯৩৯)। 'পথের পাঁচালী'র কথনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা গ্রহণ করেছেন তা আদৌ Stream of consciousness নয়। প্লট ধর্মী উপন্যাস। গল্প বলছেন, 'পড়ন্ত ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখীর ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য, রাজার মত ভাণ্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এইটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই, বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়'। বিহারের জনপদ নিয়ে, 'আরণ্যক' উপন্যাস। তার নিসর্গ নির্ভরতা এবং নিসর্গলগ্ন যে নরনারী, তাদের বাচন, উচ্চারণ, তাদের ক্ষুধা, তাদের তৃষ্ণা যেভাবে এসেছে এই উপন্যাসে এবং যে প্রকৃতির বর্ণনা আছে সে তো একজন কবিরই সৃষ্টি।

মানব মনের জটিল অন্ধকার, অন্ধ সুড়ঙ্গ পথ মানিকের দৃষ্টির সুতীব্র আলোয় যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে যখন উপন্যাস লেখা শুরু করলেন তখন তাঁর উপন্যাসের কথনও 'বিশিষ্ট' হয়ে উঠল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসটির কথন। উপন্যাসটিতে দেখা যায় কথ্যভাষার প্রয়োগে লেখক একটি 'বিশিষ্ট' বাচন গড়ে

তুলেছেন। যেখানে দেশজ কথন রীতির একটি পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসের চরিত্রগুলি লোকায়ত জগৎ থেকে উঠে এসেছে। এছাড়াও ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ (১৯৩৬) উপন্যাসটির কথনের আলোচনাও করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। পরিশেষে বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর উপন্যাসের কথন সতীনাথের উপন্যাসের কথনে কোথাও প্রভাব ফেলেছিল কিনা---তার একটি তুল্যমূল্য আলোচনা করা হয়েছে।

চ তু র্থ অ ধ্যা য়

সতীনাথের উপন্যাসে কথনতত্ত্বের প্রায়োগিক দিক

উপন্যাসের ক্ষেত্রে সতীনাথ ভাদুড়ী ছিলেন শিল্প সচেতন শিল্পী। তাঁর এই সচেতন শিল্পীসত্তা উপন্যাসের শিল্প ভাবনায়ও রেখেছে ছাপ। উপন্যাসের কথনরীতি নিয়ে তিনি সর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে পাশ্চ্যাত্য সাহিত্য চর্চার পরিশীলিত মনন ও প্রজ্ঞা বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস সংখ্যা ছয়। ‘জাগরী’ (১৯৪৫), ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’ (১৯৪৯-৫১), ‘চিত্রগুপ্তের ফাইল’ (১৯৪৯), ‘অচিন রাগিণী’ (১৯৫৪), ‘সংকট’ (১৯৫৭) ও ‘দিগ্‌ভ্রান্ত’ (১৯৬৬)। ‘দিগ্‌ভ্রান্ত’ ছাড়া প্রায় সব উপন্যাসেই মূলত চেতনাপ্রবাহ রীতির মাধ্যমে পাত্র-পাত্রীরা তাদের অন্তর্লোকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উন্মোচন করেছে। সবগুলি উপন্যাসেই কথনতত্ত্বের প্রায়োগিক দেখানো হয়েছে। উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘জাগরী’ ও ‘সংকট’ উত্তম পুরুষে লেখা। এখানে আত্মকথন ভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে। আর ‘ঢোড়াই চরিতমানস’, ‘অচিন রাগিনী’ উপন্যাসে ভূমিকানুগ কথনরীতি এসেছে। ‘চিত্রগুপ্তের ফাইল’ ও ‘দিগ্‌ভ্রান্ত’ উপন্যাস প্রথম পুরুষে লেখা হয়েছে। এখানে সর্বজ্ঞকথন রীতির সূত্র মেনে চলা হয়েছে। ‘জাগরী’ উপন্যাসটিতে কথকস্বরের বিচিত্র ভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। লেখকের বিষয়ী অভিজ্ঞতার এই রূপায়ণের অভিপ্রায়ে উপন্যাসটির কথন নির্দিষ্ট হয়েছে। ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলন, তার সূচনা, বিকাশ ও পরিণতিতে জটিল---বস্তুত এর পটভূমি ও মাত্রা বিরাট উপন্যাসের ছন্দেই আসতে পারে যথার্থভাবে। কিন্তু একটি আন্দোলনের অভিঘাত পারিবারিক বৃত্তে ব্যক্তি সম্পর্কে কি প্রতিক্রিয়া-ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তার চিত্রায়ণ, ৪২ এর আন্দোলনের বিষয় থেকে আলাদা। এই উপন্যাসের পটভূমি ১৯৪২ এর ভারতছাড়ো আন্দোলন। এখানে ৪২ পটভূমি মাত্র। আসলে অভিপ্রেত বিষয় ঐ পরিবারের চারটি চরিত্র। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চারটি বিলু, নীলু, বাবা ও মা। এদের

স্মৃতিচারণা ও অনুভব কথনের মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনি রচিত হয়েছে। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> ‘একেবারে নূতন কথা, নূতন সুর, নূতন সব মানুষের ভীড়, একেবারে সম্পূর্ণ নূতন মনোভাব লেখকের অপরিচিত নাম, কিন্তু রচনার অভাবিত উৎকর্ষ। চমক জাগল। সম্পূর্ণ অভ্রান্তভাবে কালাতীত সাহিত্য কর্মের ছাপ।’[৯]

এই উপন্যাসে কথনতত্ত্বের প্রায়োগিক দিকের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। বাখতিন কথিত Chronotope এরও প্রয়োগ ঘটেছে এই উপন্যাসে। সময় এবং পরিসর এর মূল আলোচ্য বিষয়। এই উপন্যাসের সময় ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলন। আর পরিসর জেল বা জেলগেট। বিয়াল্লিশের বিস্ফোরক সময় উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে কারাগারের পরিসরে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে। কারাগারের এক একটি কক্ষে ও জেলগেটে তারা পরস্পর অবস্থান করেও সময় তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। লেখক যেন একই সময় ও স্পেসের সংযোগে চরিত্রগুলির কথন তুলে ধরেছেন। যেখানে লেখক কোথাও নেই। এই আখ্যানকৌশল যেমন জেলখানার স্পেস ছাড়া সম্ভব হত না তেমনি যে সময়কে উপন্যাসে অবলম্বন করা হয়েছে সেই সময়গত ক্রমটিও খুব ছিল জরুরী। সময় এবং পরিসর যে জাগরীতে chronotope রচনা করেছে তা সম্ভব হয়েছে একটি বিশেষ পরিবারের জন্যই।

আর ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’ উপন্যাসে লেখক অনুকৃতির কথনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রামকথার ভারতবিখ্যাত ফ্রেম ব্যবহার করেছেন সতীনাথ আলোচ্য উপন্যাসে। জেম্‌স্‌ জয়েস তাঁর উপন্যাস ‘ইউলিসিস’ এ যেমন হোমারের ‘ওডিসি’র আদল গ্রহণ করেছেন সতীনাথও তেমনি ‘রামচরিতমানস’ এর আদলে তৈরি করেছেন তাঁর ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’। একালের রামচন্দ্র সতীনাথের কাছে তাঁর ঢোঁড়াই। দেশজ উপকরণে তিন দশকের ভারতীয় এক জীবনছন্দকে ধরবার জন্য দীর্ঘায়িত রাম জীবনের কাহিনিকে নির্বাচন করেছেন তিনি। তুলসীদাসজীর হিরো ছিলেন রামচন্দ্র। সতীনাথের কাছে তাঁর একালের হিরো ঢোঁড়াই। একটি টিপিক্যাল চরিত্রকে ইনডিভিজুয়াল হওয়ার ইতিহাস রচনায় ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’ কে নির্মাণ করেছেন লেখক। তুলসীদাসের ‘রামচরিতমানস’ এর বৈশিষ্ট্য বইটির ফর্মের অকৃত্রিম সারল্য ও বিশালতা সতীনাথ সন্তর্পণে এই আদলই অবলম্বন করেছেন। ঢোঁড়াই একটা প্রোটোটাইপ, লোকায়ত জীবন থেকে উঠে আসা।

আমরা জানি, ভূমিকানুগ কথনরীতিতে কাহিনি বর্ণনা করে কথকই। এই কথনে নিরীক্ষক কখনো কথক, আবার কখনো কাহিনির কোনো চরিত্র হয়ে থাকে। কথক কাহিনির বাইরে অবস্থান করে, ফলে তার নিরীক্ষণে বহিঃপ্রেক্ষিত প্রাধান্য পেয়ে থাকে। উপন্যাসের চরিত্রই যখন নিরীক্ষকের ভূমিকা নিয়ে থাকে তখন তার নিরীক্ষণে অন্তঃপ্রেক্ষিত গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এই অন্তঃপ্রেক্ষিত এবং বহিঃপ্রেক্ষিত অনবরত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ভূমিকানুগ কথন পরিস্থিতি গড়ে ওঠে।

উপন্যাসের সূচনাংশে কথকের বর্ণনা :

> ‘অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া। রামচরিতমানসে এর নাম লেখা আছে ‘জীর্ণারণ্য’। পড়তে না পারো মিসিরজীকে দিয়ে পড়িয়ে নিও।’[১০]

এখানে নিরীক্ষক কথক। সে কাহিনির কোনো চরিত্র নয়। এবং তাই তাঁর কথনে কোনো অন্তঃপ্রেক্ষিত ধরা পড়েনি। বহিঃপ্রেক্ষিতই ধরা দিয়েছে।

‘চিত্রগুপ্তের ফাইল’ উপন্যাসটি সর্বজ্ঞকথনরীতির নিদর্শন। ‘জাগরী’ ও ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’ উপন্যাসে আমরা দেখেছি লেখক সেখানে বিষয়বস্তুকে অধ্যায়-পরিচ্ছেদের কাঠামোতে বিন্যস্ত করে কথন-কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু, আলোচ্য উপন্যাসে কোথাও অধ্যায় বিভাজন নেই। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শিউচন্দ্রিকা। সেই উপন্যাসের কথক। তার মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়েছে ঘটনা ও অন্যান্য চরিত্রের কথা। স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে অভিমন্যু-মিনাকুমারীর প্রেম, বলীরামপুর জুটমিলের শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ-ষড়যন্ত্র, অভিমন্যুর নির্বাসন, আহত প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাপুঞ্জ উপস্থাপন করেছেন ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে। কাহিনির পরবর্তী ঘটনাবলী বিবৃত হওয়ার পর এই পাঠকৃতিতে পূর্বের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কথনতত্ত্বে একেই পূর্বকথন বলা হয়।

‘অচিন রাগিণী’ উপন্যাসটিতে চেতনাপ্রবাহমূলক কথনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসটির কথক পিলে। লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী নতুন দিদিমা-পিলে-তুলসীর প্রাত্যহিক দেখা সাক্ষাতের ঘটনা থেকে ২৮ টি টুকরো দৃশ্যের সাহায্যে এদের টান-ভালোবাসার সম্পর্কের ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। এর মধ্যে ২১ টি দৃশ্যের কেন্দ্রে রয়েছেন নতুন দিদিমা। বাকি ৭ টি দৃশ্যে পিলে-তুলসীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও নতুন দিদিমা আর পিলের স্মৃতিচারণ সূত্রে এবং সংলাপে ১০ টি ঘটনাসূত্র সংযোজিত হয়েছে। যেগুলো তাদের অন্তর্লোক উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করেছে। এই দৃশ্যগুলি একত্র

বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট রীতি লেখক গ্রহণ করেননি। নতুন দিদিমা এবং পিলের চেতনাপ্রবাহের মাধ্যমে দৃশ্য ও ঘটনা পরম্পরার বিন্যাস ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসে পিলে ও নতুন দিদিমার আত্মচিন্তনে অতীত থেকে বর্তমানে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার অনুষঙ্গে চেতনাপ্রবাহমূলক কথন এসেছে। এভাবে একটি পর্যায় থেকে আরেকটি পর্যায়ে উত্তরণের সময়ে পাঠকের মনে কোনো বিভ্রান্তি যাতে তৈরি না হয় সেদিকে সতীনাথের বিশেষ সচেতনতা ছিল। উপন্যাসে লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের পাশাপাশি চরিত্রের স্বগত কথনের মাধ্যমে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছেন।

'সংকট' উপন্যাসটি আত্মকথনের যৌগিক রীতির উপন্যাস। এই উপন্যাসের অধ্যায় সংখ্যা তিন। প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ের কথক সেক্রেটারি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথক বিশ্বাসজী। বিশ্বাসজীর কথিত অধ্যায়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আত্মকথনধর্মী উপন্যাসে কথকের অবস্থান কাহিনি মধ্যে হয়ে থাকে। এবং কথকের অবস্থান কাহিনিতলে হওয়ার জন্য এই ধরণের কথনে অন্তঃপ্রেক্ষিত গুরুত্ব পেয়ে থাকে। উপন্যাসটিতে দুইজন কথক রয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ের কথক সেক্রেটারি হওয়ায় এই অধ্যায়ের কথনে নিরীক্ষকের ভূমিকায় সেক্রেটারিকে রাখা হয়েছে। তবে সেক্রেটারির ভূমিকা এখানে অনেকটা সূত্রধরের মতো। তিনি কেবল উপন্যাসটিতে পাঠকের সঙ্গে বিশ্বাসজীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং উপন্যাসের শেষে বিশ্বাসজীর পরিণতি কী হল তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথক বিশ্বাসজী। যার পোশাকি নাম যুক্তিনাথ বিশ্বাস। এই অধ্যায়ে মূলত বিশ্বাসজীর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করা হয়েছে।

'সংকট' উপন্যাসটি প্রতীকধর্মী। জীবনের প্রতিষ্ঠাভূমি কী হওয়া উচিত, যুক্তিবাদ না অলৌকিক বিশ্বাস, তা নিয়ে টানাপোড়েন---এই সত্যের অন্বেষণে বিশ্বাসজীকে বারবার ফিরতে হয়েছে। জীবনকে তিনি যুক্তির ছক ভেঙে যুক্তির অতীত কোনো এক বিশ্বাসের জগতে নিয়ে গেছেন। আবার সেই ছক ভেঙে এক নির্লিপ্ত যুক্তি ও যুক্তি নিরপেক্ষ অন্ধবিশ্বাস---এই দুই মেরুর বিপরীত প্রতিষ্ঠানকে অতিক্রম করে সেক্রেটারির কাছে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার সার, নির্যাসটুকু উপহার দিয়েছেন। এককথায় বিশ্বাসজীর মনোজগতের বিবর্তন দেখানোই এই উপন্যাসের বিষয়।

'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসটি প্রথানুগ কথনরীতিতে লেখা। প্লটধর্মী উপন্যাস। কথনে কোথাও নতুনত্ব দেখা যায়নি। উপন্যাসটির কথন ব্যাখ্যামূলক। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমীরীতির অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাসে বর্ণনাধর্মি ভঙ্গিমাতে উপন্যাসের কথন গড়ে তুললেও পরবর্তীকালে এই প্লটধর্মী কথন ছেড়ে দিয়ে তিনি ব্যাখ্যামূলক কথন গড়ে তুলেছিলেন। সেই কথনরীতির ঐতিহ্য মেনেই এই উপন্যাসের কথনশৈলী গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের শুরুতে ও শেষে যজ্ঞডুমুর গাছের কথা এসেছে। এই 'গাছ' উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। উপন্যাসের শুরুতেই পাওয়া যায়, গাছটার ছায়া অনেকদূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। গাছটা থেকেই হরিদাস ব্রহ্মচর্যপোষক রস সংগ্রহ করে, গাছটা থেকেই সে পড়ে গিয়ে পা ভাঙে, গাছটার ডালেই সে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ে। গাছটার সাথে হরিদাসের মিল আছে---শুধু ছায়া বিস্তার করতে পারে, সে সুবোধবাবুর বাড়ির ফটকের বাইরের অস্তিত্ব, তাকে উপড়ে ফেলে দেওয়াটাই দরকার ছিল---সেটা হয়ে ওঠেনি। হরিদাসের আত্মহত্যার পর সেটা আপনিই সম্পন্ন হবে। গাছটা আমার, কি আমার নয়, গাছটা কাটার হক আমার আছে কি নেই---এমন নানা জট নানা নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের অভিমান আমাদের জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। সুবোধবাবুর সংসারে হরিদাস সমস্যাও তাই। হরিদাসের ওপর কার এক্তিয়ার---সুবোধবাবুর, অতসীবালার; সুবোধবাবু সেটাই ঠিক করতে পারলেন না। সুতরাং, গাছটা একটা অনাত্মীয় অথচ আত্মীয়িতালিপ্সু অস্তিত্বের প্রতীক। উপন্যাসের চরিত্র পাত্রগুলির মতো হরিদাসের অস্তিত্বের প্রতীক---যজ্ঞডুমুরের গাছের মতোই তারও বড়ো বড়ো পাতার বাক্যজালে ঢাকা আড়ম্বর---ব্রহ্মচর্যের কৃত্রিম কিংবদন্তি, শেকড়ের জোর নেই---বস্তুত ভূমিকাবিহীন। হরিদাসের মৃত্যুর পরেই যেন গাছটাও তেজ হারিয়ে ফেলল---এবার তার ছায়া ছোট হয়ে আসবে। এখানেই একটি সুতোর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক যেন প্রথমের সঙ্গে শেষকে আগাগোড়া বেঁধে রেখেছেন। কাহিনি বিন্যাসের এই প্রক্রিয়া মূলত প্লটধর্মী উপন্যাসের সরল প্রক্রিয়া, যা বঙ্কিম প্রবর্তিত বাংলা উপন্যাসে অনুসৃত হয়েছে। সতীনাথের হাতে এই প্লটধর্মী উপন্যাসের কথন বদলে ফেলার যে দুরন্ত প্রয়াস, তাঁর 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' রচনার বেলায় প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল, এখানে দুঃখজনকভাবে তা অনুপস্থিত।

'দিগ্‌ভ্রান্ত' রচনার আগে সতীনাথের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি ছিল, বৃন্দাবনে যাওয়া ও বৈষ্ণব তথ্য, গ্রন্থসংগ্রহ ও অধ্যয়ন তার প্রমাণ। কিন্তু এই পরিশ্রমী শিল্পী শেষ অবধি

তাঁর এই উপন্যাস সৃষ্টিতে নিজের শিল্পী সত্তার সমস্ত প্রচেষ্টা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন কিনা---আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। গ্রন্থরচনা শুরু করার পরে সম্ভবত শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন সতীনাথ। প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি রচনার সময় শিল্পী সতীনাথের যে মেধাবী পরিশ্রম ও সতর্কতা জাগ্রত ছিল, 'দিগ্ভ্রান্ত' রচনার বেলায় দেখা গিয়েছে তার অনুপস্থিতি। খুবই সাদামাটা কথনপদ্ধতিতে এই উপন্যস সমাপ্ত করেছেন লেখক। সম্পূর্ণ রচনাটি পুনর্বিবেচনারও সময় পাননি তিনি। আর যতটুকু দেখে গিয়েছেন সেখানেও লগ্ন হয়নি সতীনাথীয় শ্রম ও শৈলী।

প ঞ্চ ম অ ধ্যা য়

সমকালীন বাংলা উপন্যাসের কথনরীতি : সতীনাথের স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান

সতীনাথের উপন্যাসে কথনতত্ত্বের প্রায়োগিক দিক জানার পর সতীনাথ সমকালীন বাংলা উপন্যাসের কথনরীতিও জানা দরকার। তাহলেই সতীনাথের উপন্যাসের কথনবিশ্বকে আমাদের চিনতে সুবিধা হবে। সমকালে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অধিকাংশই কথনের প্রচলিত রীতি পদ্ধতিতে লিখেছেন আমাদের আলোচনায় তাঁদের গ্রহণ করা হয়নি। যাঁরা সমকালীনের মধ্যে একটু বিশিষ্ট নতুন কথন আনতে চেয়েছেন আমাদের আলোচনায় তাঁদের গ্রহণ করা হয়েছে। সতীনাথ সমকালীন ঔপন্যাসিক হিসেবে আমরা নির্বাচন করেছি বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-৭৪) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) কে। বনফুলকে নিয়েছি এই জন্য যে একই বিষয় নিয়ে বনফুল লিখছেন বিহারের জনজীবন। বনফুলের রচনার মধ্যে একটা ছিল সংক্ষিপ্ততা, সংহতি। এতো কমের মধ্যে এতো বেশি বিষয় নিয়ে আসেন যা তার কথনকে বিশেষভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। দুটি উপন্যাসের কথা গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের আলোচনায়। 'ডানা' (১৯৪৮, ১৯৫০, ১৯৫৫) ও 'অগ্নীশ্বর' (১৯৫৯)। আত্মকথনরীতির এই উপন্যাসগুলিতে বনফুল যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসে নায়ক অগ্নীশ্বরের আত্মকথন ব্যবহার করেছে অন্য একটি চরিত্র। তার নাম খগেন। সে প্রাক্তন বিপ্লবী। নায়ক অগ্নীশ্বরের কাহিনি সে বর্ণনা করেছে বাইরে থেকে। তবে নিরীক্ষক হিসেবে সে যে সবসময় ঘটনার সাথে যুক্ত থেকেছে এমন নয়। কিন্তু, সে কাহিনি বলে গেছে প্রতিনিয়ত। উপন্যাসটি আত্মকথনরীতির হলেও খগেন এখানে সর্বজ্ঞকথকের ভূমিকা নিয়েছে। মুজতবা আলী তার বয়ানের জন্যই অনন্য। বিশেষ করে তিনি যে ইসলামিক জীবন থেকে উঠে আসা একটি মানুষ

তাঁর বাচন, তাঁর বাগ্‌ভঙ্গি, তাঁর শৈলীতে, তাঁর মিথপ্রয়োগে ও ইসলামিক অনুষঙ্গ গুলো প্রয়োগে একটা অপূর্ব সেকুলার কিন্তু একটি বিশিষ্ট বাচন তিনি গড়ে তুলেছেন। আমরা তাঁর ‘শব্‌নম’ (১৯৬০) ও ‘শহ্‌র্‌ইয়ার’ (১৯৬৯) এই দুটি উপন্যাসের কথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আত্মকথার এই উপন্যাসগুলির বাগ্‌বিন্যাস অসাধারণ। আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিতার অজস্র প্রয়োগে উপন্যাসটির কথন-কাঠামো গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯) উপন্যাসের স্টাইল কিছুটা রয়েছে ‘শবনম’ উপন্যাসটির আদলে। উপন্যাসটিতে লেখক কথন-কাঠামো নির্মাণে নতুনত্ব দেখাতে পারেননি। টেকনিকের চেয়ে বিষয়ের ভিন্নতাতেই লেখকের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর বুদ্ধদেব বসুকে নিয়েছি তার কাব্যিক প্যাটার্নের জন্য। ‘সাড়া’ (১৯৩০) ও ‘রাত ভরে বৃষ্টি’ (১৯৬৭) এই দুটি উপন্যসের কথনের আলোচনা করা হয়েছে। চেতনাপ্রবাহরীতির এই উপন্যাসগুলিতে কথনের ভাষাদেহ নির্মাণে শিল্পীর অসাধারনত্ব ধরা পড়েছে। ‘রাত ভরে বৃষ্টি’ উপন্যাসটির কথক দু’ জন। মালতী ও তার স্বামী নয়নাংশু। নয়নাংশুর বন্ধু জয়ন্তর সঙ্গে মালতীর সমাজনিষিদ্ধ মিলনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এদের অবৈধ মিলনের ঘটনায় মালতী ও নয়নাংশু দুটি চরিত্রের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত ও স্মৃতিচারণার মাধ্যমে এই উপন্যাসের কথন নির্মিত হয়েছে। যা চেতনাপ্রবাহরীতিতে রচিত। এঁদের রচনায় কথনের ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা আছে আলোচ্য অধ্যায়ে। পরিশেষে সতীনাথের উপন্যাসের কথনের সঙ্গে এঁদের উপন্যাসের কথনের প্রকৃতি কিরূপ— তার একটি তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে।

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

সতীনাথ-উত্তর বাংলা উপন্যাসের কথনরীতি : সতীনাথের স্বতন্ত্রতা

এখানে আলোচনা করা হয়েছে সতীনাথ-উত্তর বাংলা উপন্যাসের কথনরীতি ও সতীনাথের স্বতন্ত্রতা নিয়ে। সতীনাথ-উত্তর বাংলা ঔপন্যাসিক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে---মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১) ও দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০) কে। এই অধ্যায়ের আলোচনায় দুটো প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এক, উত্তরকাল সতীনাথের কাছ থেকে কী কিছু পেয়েছে? দুই, নাকি সময়ের উত্তরাধিকারেই উত্তরকালের এইসব ঔপন্যাসিক বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন? যাঁরা সতীনাথ উত্তরকালে বাংলা উপন্যাসের কথন নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা-

নিরীক্ষা করেছেন। ‘হাজার চুরাশির মা’ (১৯৭৪) ও ‘অরণ্যের অধিকার’ (১৯৭৯) মহাশ্বেতা দেবীর এই দুটি উপন্যাসের কথনরীতির আলোচনা করা হয়েছে। ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসটি বীরসা মুণ্ডার জীবন নিয়ে রচিত। এই উপন্যাসে মহাশ্বেতা আসলে বীরসার নেতৃত্বাধীন মুণ্ডাদের আত্মজাগরণের ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন। সেই ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে কল্পনার মিশেলে লেখিকা এই উপন্যাস নির্মাণ করেছেন। ইতিহাসের সত্যকে আখ্যানের সত্যে পরিবেশন করেছেন মহাশ্বেতা। ফলে যে বাচন তিনি গড়ে তুলেছেন সেখানে মুণ্ডারি ভাষায় বাক্য সংযোজনের ফলে খুব সহজেই পাঠকেরা সেই ইতিহাসের সঙ্গী হয়ে যেতে পারে। আখ্যানের শেষে একটি উপসংহার যোগ করে ইতিহাসের ঐতিহ্যকে বর্তমানের সঙ্গে সহজেই যুক্ত করে দেন। বীরসার মৃত্যু যে প্রকৃত বিপ্লবের উৎসবীজকে সমূলে বিনাশ করে দিতে পারে না, সেই বিশ্বাসটুকু লেখক জাগিয়ে রাখতে চান জরতী করমীর সত্তার প্রত্নস্মৃতির মধ্য দিয়ে। এই বহমান নদী, আকাশ, গাছ, পাহাড়ের অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে। সর্বজ্ঞকথনে লেখা এই উপন্যাসের কথনে লেখিকার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। অমিয়ভূষণের উপন্যাসের মধ্যে আমরা নিয়েছি ‘গড় শ্রীখণ্ড’ (১৯৫৭) ও ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ (১৯৮১) উপন্যাস দুটিকে। উপন্যাসগুলিতে চরিত্রানুগ কথনরীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে। উপন্যাসদুটিতে চরিত্রদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির পাশাপাশি খুব সচেতনভাবেই কথকের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। “গড় শ্রীখণ্ড’ উপন্যাসটিতে নিরীক্ষক কখনো কথক আবার কখনো উপন্যাসের কোনো চরিত্র। এখানকার বাচনে লৌকিক শব্দের ব্যবহার রয়েছে। দেবেশ রায়ের উপন্যাসের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ (১৯৮৮) ও ‘তিস্তাপুরাণ’ (২০০০) উপন্যাস দুটিকে। উপন্যাসগুলির কথনের রীতি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাসের কথনে স্বতন্ত্রতার ছাপ রেখেছেন। ইংরেজি উপন্যাসের কথনের যে রীতি এতদিন বাংলা উপন্যাসে প্রচলিত ছিল, সেখান থেকে তিনি অনেকটাই সরে এসেছেন। উপন্যাসদুটির পাঠে সেই পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসটিতে তিস্তা নদীর ধাবমান বিস্তারের দু’ পারে যাপিত জনপদজীবনের কথা তুলে ধরতে গিয়ে সমাজবিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় তিনি বিচরণ করেছেন। এলাকার ভিন্নতার জন্য তিনি ব্যক্তিসমস্যা থেকে ব্যক্তিসমস্যায় সরে গেলেও তার কেন্দ্রটি মূলত ন্যস্ত এমন একজনের ওপর ঐ জীবনবিস্তারের মধ্যে যার শরীরী চৈতন্যের নোঙরটি সব অর্থেই অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা। তার নাম বাঘারু। ‘তিস্তাপুরাণ’

উপন্যাসে পুরাণের ধারণাকে সামনে রেখে লেখক আখ্যানের এক নতুন রীতি নির্মাণ করেছেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদে তার আলোচনা করা হয়েছে।

উপন্যাস ত্রয়ী কথনরীতিতে সতীনাথের দ্বারা খুব একটা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁরা নিজেদের মতো করে কথনবিশ্ব তৈরি করেছিলেন। তবে সতীনাথ যে রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন তার থেকে আমরা অনুসন্ধান করতে পারি যে, যদি তাঁরা সতীনাথ পড়ে থাকেন সেই মুক্ত অঙ্গনটা, সতীনাথের দ্বারা মুক্ত হয়েছিল বলেই এঁদের বিচরণে, পদচারণার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

স প্ত ম অ ধ্যা য়

উপসংহার

বাংলা উপন্যাসের ধারায় সতীনাথের কথনরীতি একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। আধুনিক কথনতত্ত্বের নিরিখে আমরা তাঁর সবকটি উপন্যাসেরই কথনতত্ত্ব নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। প্রসঙ্গত আমরা ধরতে চেয়েছি সতীনাথ-পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসের কথনরীতি কতটা সতীনাথকে প্রভাবিত করেছিল কী আদৌ করেনি সে নিয়ে পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা আছে তৃতীয় অধ্যায়ে। অনুরূপভাবে সতীনাথ সমকালীন ও উত্তরকালীন নির্বাচিত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসগুলির নিরিখে সতীনাথের উপন্যাসগুলির কোনো প্রভাব আছে কিনা তার অনুসন্ধানও করার চেষ্টা হয়েছে। সবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাংলা ঔপন্যাসিকদের দ্বারা সতীনাথের কথনবিশ্ব নির্মিত হয়নি। আশ্চর্যজনকভাবে সতীনাথ-উত্তরকালের শক্তিশালী লেখকেরাও অনুসরণ করেননি সতীনাথের কথনরীতি। এটাই স্বাভাবিক। কেননা, প্রত্যেক শিল্পীরই নিজস্ব একটি কথনজগৎ তৈরি হয়, যা তাঁকে দেয় অনন্য বিশিষ্টতা। আমাদের গবেষণায় সতীনাথের কথনরীতির সেই অনন্য বিশিষ্টতাই অনুসন্ধানের বিষয় হয়েছে।

সূত্র ও টীকা :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, ১৯৯৬, উত্তর প্রসঙ্গ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১২২-২৩

২. Prince, Gerald, Narratology : The Form and Functioning of Narrative, Mouton Publishers, Berlin, New York, Amsterdam, 1982, p-5

৩. সরকার, পবিত্র, ২০১৭, কথাসূত্র, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ১১-১২

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, সুবল, (সম্পা.) ১৯৭২, সতীনাথ স্মরণে, পাটনা, ভারতীয় ভবন, পৃ. ৮

৫. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ১৩৬৭, সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃ. ৫-৬

৬. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ২০১৭, সতীনাথ রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ৫১৪

৭. ইংরেজি অনুবাদ L. Scott কৃত Austin, University of Texas Press

৮. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ, ১৯৯২, বিভূতিভূষণ : দুটো একটা কথা, (বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ, সম্পাদক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৪৫

৯. গঙ্গোপাধ্যায়, সুবল, (সম্পা.) ১৯৭২, সতীনাথ স্মরণে, পাটনা, ভারতীয় ভবন, পৃ. ৮০

১০. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ২০১৭, সতীনাথ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ৩

গ্রন্থপঞ্জি

...এক...

প্রাথমিক গ্রন্থপঞ্জি

১. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ১৪২৪, জাগরী, সতীনাথ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ।

২. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ১৪২৪, ঢোঁড়াই চরিতমানস, সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ।

৩. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ১৪২৪, চিত্রগুপ্তের ফাইল, সতীনাথ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

৪. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ১৪২৩, অচিন রাগিণী, সতীনাথ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

৫. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ১৪২৩, সংকট, সতীনাথ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

৬. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ১৪২৪, দিগ্‌ভ্রান্ত, সতীনাথ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

৭. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, ১৯৮২, ডানা, বনফুল রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয়।

৮. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, ১৯৮২, অগ্নীশ্বর, বনফুল রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয়।

৯. সৈয়দ মুজতবা আলী, ১৩৯৫, শব্‌নম, রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ।

১০. সৈয়দ মুজতবা আলী, ১৩৯৫, শহ্‌র্‌-ইয়ার, রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ।

১১. বসু, বুদ্ধদেব, ১৯৩০, সাড়া, কলকাতা, গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্‌ এণ্ড কোং।

১২. বসু, বুদ্ধদেব, ১৯৯৪, রাত ভরে বৃষ্টি, ঢাকা, আজকাল।

১৩. দেবী, মহাশ্বেতা, ১৪২৬, অরণ্যের অধিকার, কলকাতা, করুণা।

১৪. দেবী, মহাশ্বেতা, ১৯৮৮, হাজার চুরাশির মা, কলকাতা, করুণা।

১৫. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ১৯৮৭, গড় শ্রীখণ্ড, কলকাতা, দে'জ।

১৬. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ১৯৮১, মহিষকুড়ার উপকথা, কলকাতা, দে'জ।

১৭. রায়, দেবেশ, ২০২১, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, কলকাতা, দে'জ।

১৮. রায়, দেবেশ, ২০০০, তিস্তাপুরাণ, কলকাতা, দে'জ।

...দুই...

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

প্র থ ম প র্যা য়

বাংলা গ্রন্থ

১. কামাল, বেগম আখতার, ২০১০, মহাবিদ্রোহের আখ্যানতত্ত্ব ও কথাশিল্প, ঢাকা, ধ্রুবপদ।

২. গুপ্ত, ক্ষে , ১৯৯৪, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (২), কলকাতা, গ্রন্থনিলয়।

৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র, ১৯৯৫, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (১), কলকাতা, গ্রন্থনিলয়।

৪. গুপ্ত, ক্ষেত্র, ২০০০, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৩), কলকাতা, গ্রন্থনিলয়।

৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র, ২০০২, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৪), কলকাতা, গ্রন্থনিলয়।

৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র, ২০০৫, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৫), কলকাতা, গ্রন্থনিলয়।

৭. গুপ্ত, ক্ষেত্র, ২০১০, বঙ্কিম উপন্যাসের শিল্পরীতি, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন।

৮. গুপ্ত, রবীন্দ্র, ১৯৯৫, উপন্যাস জিজ্ঞাসা, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়।

৯. গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১, উপন্যাস প্রসঙ্গে, কলকাতা, তুলিকলম।

১০. গোস্বামী, অচ্যুত, ১৯৬৮, বাংলা উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, পাঠভবন।

১১. ঘোষ, মৈত্রেয়ী, ১৯৮৫, সতীনাথ ভাদুড়ী : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায়, কলকাতা, মডার্ণ কলাম।

১২. চক্রবর্তী, অলোক, ২০২১, আখ্যানের তত্ত্বভুবন, কলকাতা, আশাদীপ।

১৩. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ, ১৯৮৯, বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ, কলকাতা, বর্ণালী পাবলিকেশন।

১৪. চক্রবর্তী, বারিদবরণ, ১৯৮০, বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

১৫. চক্রবর্তী, সুমিতা, ১৯৯০, উপন্যাসের বর্ণমালা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

১৬. চট্টোপাধ্যায়, শিশির, ১৯৬৯, উপন্যাস পাঠের ভূমিকা, কলকাতা, বুকল্যান্ড।

১৭. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, ২০১১, উপন্যাসের রূপ ও রীতি, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং।

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪০২, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী।

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪০২, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী।

২০. ত্রিপাঠী, অমলেশ, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

২১. দত্ত, সম্রাট, ২০১৭, আখ্যান বাখ্যান ও গদ্যচর্চা, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২২. দাশ, শিশিরকুমার, ১৯৮৬, কাব্যতত্ত্ব, কলকাতা, প্যাপিরাস।

২৩. দাশগুপ্ত, রাহুল, ২০১০, আখ্যানের দুনিয়া, কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

২৪. দত্ত, বীরেন্দ্র, ১৯৯৮, বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

২৫. দত্ত, সম্রাট, ২০১০, বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২৬. দাস, অমিতাভ, ২০১৪, আখ্যানতত্ত্ব, কলকাতা, ইন্দাস।

২৭. দে, অশোককুমার, ১৯৯৯, বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, কলকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি।

২৮. দে, আশিষকুমার, ১৯৮৩, উপন্যাসের শৈলী: তারাশঙ্কর ও মানিক, কলকাতা, প্যাপিরাস।

২৯. নারঙ, গোপীচন্দ, ২০০৯, গঠনবাদ, উত্তর-গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, সাহিত্য আকাডেমি।

৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, ১৯৯০, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি।

৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র, ১৮৯৮, সাহিত্য দর্পণ (সম্পা), কলকাতা, প্রকাশ ভবন।

৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, ২০১২, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি।

৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, ১৯৯৩, বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, ১৯৯৭, সতীনাথ ভাদুড়ী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার, ১৯৯৪, বাংলা উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিকতা, কলকাতা, জিজ্ঞাসা।

৩৬. বর্মণ, রমেন্দ্র, ১৯৮৯, রাজনৈতিক চেতনা ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, বাণীপ্রকাশ।

৩৭. বর্মা, উদয়শঙ্কর, ২০০৮, উপন্যাসের অন্যভুবন, কলকাতা, কবিতীর্থ।

৩৮. বসু, অরুণকুমার, ২০০৬, কথাশিল্পের নানাদিক, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ।

৩৯. বিশ্বাস, জয়ন্ত, ২০১১, বাংলা উপন্যাসের পুনর্বিচার, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী।

৪০. ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য, ২০১১, কথনতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী।

৪১. ভট্টাচার্য, অরূপকুমার, ১৩৯১, সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

৪২. ভট্টাচার্য, অরূপকুমার, ১৯৮৭, আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

৪৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ১৯৯৫, আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

৪৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ১৯৯৭, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

৪৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ১৯৯৮, জাক দেরিদা, তাঁর বিনির্মাণ, মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

৪৬. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ১৯৯৮, রোলাঁ বার্ত, তাঁর পাঠকৃতি, মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

৪৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ১৯৯৯, উপন্যাসের প্রতিবেদন, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।

৪৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ১৯৯৯, উপন্যাসের সময়, কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

৪৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০০১, জাঁ বদ্রিলার : সময়ের চিহ্নায়ন, মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

৫০. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০০২, বাখতিন, কলকাতা, অনুষ্টুপ।

৫১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০০৫, আখ্যানের সাতকাহন, মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

৫২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০০৫, উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৫৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০১০, উপন্যাসের বিনির্মাণ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৫৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০১০, বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৫৫. ভট্টাচার্য, দেবীপদ, ২০০৩, উপন্যাসের কথা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৫৬. ভট্টাচার্য, মালিনী, ১৯৯৬, নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৫৭. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, ২০০৬, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী।

৫৮. ভট্টাচার্য, সুভাষ, ১৯৯৯, ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

৫৯. মজুমদার, অভিজিৎ, ২০০৭, শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৬০. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, ১৯৮৫, উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, কলকাতা, সান্যাল এন্ড কোম্পানি।

৬১. মজুমদার, সন্তোষকুমার, ১৯৮৫, সতীনাথ ভাদুড়ী: জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী।

৬২. মণ্ডল, মননকুমার, ২০১৪, আধুনিক বাংলা উপন্যাস : ব্যষ্টি ও সমষ্টি, কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

৬৩. মাজী, বিপ্লব, ২০০৭, উপন্যাসের ভাষা, কলকাতা, অঞ্জলি পাবলিশার্স।

৬৪. মাজী, বিপ্লব, ২০০৯, বাংলা উপন্যাস ২০০ বছর (সম্পা), কলকাতা, অঞ্জলি পাবলিশার্স।

৬৫. মান্না, গুণময়, ১৯৯৫, বাংলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক, কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য।

৬৬. মিশ্র, দিব্যাংশু, ২০০১, সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব, মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

৬৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ১৯৯১, কালের প্রতিমা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৬৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ১৯৯৪, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে : বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৬৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ২০০১, শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৭০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ২০০৪, বাংলা কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং।

৭১. রায়, অলোক, ২০০০, বাংলা উপন্যাস : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

৭২. রায়, দেবেশ, ১৯৯১, উপন্যাস নিয়ে, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং।

৭৩. রায়, দেবেশ, ১৯৯৪, উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে, কলকাতা, প্রতিক্ষণ।

৭৪. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, ২০০০, বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং।

৭৫. লাহিড়ী, কার্তিক, ১৩৭৯, বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরি।

৭৬. লাহিড়ী, রণবীর, ২০১১, আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান, কলকাতা, চর্চাপদ।

৭৭. শ, রামেশ্বর, ১৯৮২, আধুনিক বাংলা উপন্যাস (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, উত্তরসূরি প্রকাশনী।

৭৮. সরকার, পবিত্র, ১৪১০, কথাসূত্র, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ।

৭৯. সরকার, সুমিত, ১৯৯৩, আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭), কলকাতা, পি কে বাগচী এণ্ড কোং।

৮০. সান্যাল, কমলকুমার, ১৯৮৪, উপন্যাসবীক্ষা : বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক, কলকাতা, পপুলার লাইব্রেরি।

৮১. সামন্ত, অরবিন্দ, ২০০২, সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের সাহিত্য, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৮২. সাহা, দেবকুমার, ২০১২, সতীনাথ ভাদুড়ী: উপন্যাসের নির্মাণশিল্প, কলকাতা, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র।

৮৩. সিংহ, উদয় নারায়ণ, ২০১০, সাহিত্যের ভাষা: ভাষার সাহিত্য, কলকাতা, অনুষ্টুপ।

৮৪. সিকদার, অশ্রুকুমার, ২০১১, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন।

৮৫. সেন, অঞ্জন ও সিংহ উদয়নারায়ণ (সম্পা), ১৯৯০, উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা, গাঙ্গেয়পত্র।

৮৬. সেন, নবেন্দু, ১৯৮৭, উপন্যাস প্রকরণ প্রযুক্তি ও বীক্ষণ, বারুইপুর, মহাদিগন্ত।

৮৭. সেন, সুকুমার, ২০০২, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৮৮. হক, হাসান আজিজুল, ১৯৮৯, কথাসাহিত্যের কথকতা, ঢাকা, একুশে।

৮৯. হালদার, গোপাল, ১৯৬৯, বাংলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি, কলকাতা, ডি এম লাইব্রেরি।

৯০. হালদার, গোপাল, ১৯৭৮, সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা, কলকাতা, অয়ন।

দ্বি তী য় প র্যা য়

ইংরেজি গ্রন্থ

১. Abrams, M H, 2012, A Glossary of Literary Terms, Delhi, Macmillan Publishers India Ltd.

২. Allen, Graham, 2003, Roland Barthes, London & New York.

৩. Altman, Rick, 2008, A Theory of Narrative, UK, Columbia University Press.

8. Bakhtin, M. M. 1981, The Dialogic Imagination, Michael Holquist (ed.), Austin, University of Texas Press.

৫. Bal, Mieke (ed.), 2004, Narrative Theory : Critical Concept in Literary and Cultural Studies, Vol-1, London & New York, Routledge.

৬. Bal, Mieke, 1999, Narratology : Introduction to the Theory of Narrative, Toronto Buffalo London, University of Toronto Press.

৭. Barthes, Roland, 1975, An Introduction to the structural Analysis of Narrative: New Literary History, UK, The Athlone Press.

৮. Booth, Wayne C , 1961, The Rhetoric of Fiction, Chicago & London, The University of Chicago Press.

৯. Branigan, Edward, 1992, Narrative Comprehension and Film, London & New York, Routledge.

১০. Chatman, Seymour, 1980, Story and Discourse : Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca and London, Cornell University Press.

১১. Chatman, Seymour, 1990, Coming to Terms : The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, Ithaca and London, Cornell University Press.

১২. Chatman, Seymour, 1993, Reading Narrative Fiction, New York, Macmillan Publishing Company.

১৩. Fludernik, Monika, 1993, The Fictions of Language and the Languages of Fiction, London & New York, Routledge.

১৪. Fludernik, Monika, 2009, An Introduction to Narratology, London & New York, Routledge.

১৫. Genette, Gerard, 1983, Narrative Discourse : An Essay in Method, Ithaca & New York, Cornell University Press.

১৬. Prince, Gerald, 1987, A Dictionary of Narratology, NE United States, University of Nebraska Press.

১৭. Prince, Gerald, 1982, Narratology : The form and Functioning of Narrative, NE United States, University of Nebraska Press.

১৮. Propp, V, 1970, Morphology of the Folktale, Austin & London, University of Texas Press.

১৯. Rimmon-Kenan, S, 1983, Narrative Fiction : Contemporary Poetics, London, Methuen.

২০. Scholes, Robert, 1981, 'Language Narrative and Anti-narrative' in W.J.T. Mitchell (ed.), On Narrative, Chicago & London, The University of Chicago Press.

২১. Scholes, R & Kellogg, R, 1966, The Nature of Narrative, New York, Oxford University Press.

২২. Segre, Cesare, 1983, Structures and Time, trans. John Meddemmen, Chicago & London, The University of Chicago Press.

২৩. Smith, Barbara Herrnstein, 1981, 'Narrative Versions, Narrative theories', in W.J.T. Mitchell (ed.) On Narrative, Chicago & London, The University of Chicago Press.

২৪. Stanzel F. K, 1988, A Theory of Narrative, trans. C. Goedsche, Cambridge, New York & Melbourne, Cambridge University Press.

২৫. Tobin, Patricia Drechsel, 1978, Time and the Novel, Princeton, Princeton University Press.

২৬. Thomas, Bronwen, 2016, Narrative : The Basics, London & New York, Routledge.

২৭. Todorov, Tzvetan, 1971, 'The Place of Style in the Structure of the Text', in S. Chatman (ed.) Literary Style : A Symposium, London & New York, Oxford University Press.

২৮. Todorov, Tzvetan, 1988, Literary and its Theorist, translated by Catherine Porter, London, Routledge & Kegan Paul.

২৯. Toolan, M (ed.) 1990, The Stylistics of Fiction : A Literary-Linguistics Approach, London & New York, Routledge.

৩০. Toolan, Michael. J. 1995, Narrative : A Critical Linguistic Introduction, London & New York, Routledge.

তৃ তী য় প র্যা য়

পত্র-পত্রিকা

১. দাস, অমিত, ১৯৯৪, উত্তরাধিকার, (অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা), রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

২. দে, অমর, ১৪১৮, গল্প সরণি, (মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা), কলকাতা।

৩. পাণ্ডা, স্বপন, ২০১৪, কঙ্ক, (দেবেশ রায় সংখ্যা), কলকাতা।

৪. ফুয়াদ, আফিফ, ২০০৬, 'দিবারাত্রির কাব্য', সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা, কলকাতা।

৫. ভট্টাচার্য, দিলীপন, ১৩৯৪, 'জলার্ক', (সতীনাথ ভাদুড়ী : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান) বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা।

৬. ভট্টাচার্য, সুবোধ, ১৪১০, নহবত, (অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা), উত্তর চব্বিশ পরগনা।

৭. ভৌমিক, তাপস, ২০০৬, 'কোরক', (সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা), কলকাতা।

৮. মণ্ডল, সন্তোষকুমার, ২০০২, উদ্দালক, কলকাতা।

৯. সামন্ত, সুবল, ২০০৪, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

১০. সৌরভ, অনিন্দ্য, ২০১০, শিল্প সাহিত্য, (দেবেশ রায় সংখ্যা), মেদিনীপুর।

চ তু র্থ প র্যা য়

আর্কাইভ্যাল ও বৈদ্যুতিন তথ্য

১. https://www.lifevalues.com/
২. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02564719008529957
৩. https://www.masterclass.com/articles/what-is-an-unreliable-narrator-4-ways-to-create-an-unreliable-narrator-in-writing#quiz-0
৪. https://blog.reedsy.com/unreliable-narrator/
৫. https://www.masterclass.com/articles/third-person-omniscient-narration-guide
৬. https://www.thoughtco.com/discourse-language-term-1690464
৭. https://www-archiv.fdm.uni-hamburg.de/lhn/node/58.html
৮. https://study.com/learn/lesson/prolepsis-types-examples.html
৯. https://study.com/learn/lesson/flashback-literature-purpose-types-examples.html
১০. https://www.ipl.org/essay/Homodiegetic-Narrator-Analysis-P3HMHWH4AJPR
১১. https://books.google.co.in/books/about/Fictions_of_Discourse.html?id=KvNcOtqAkPAC&redir_esc=y#v=onepage&q=hypodiegetic%20narrator&f=false